International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 2800)
Volume-III, Issue-VI, May 2017, Page No. 1-11
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল : অন্তরঙ্গ পাঠ

Dr. Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept of Foreign Languages, University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The object of study of the present paper is a well-known song of Tagor: amar kantha hate gan ke nilo bhulaye. This study is however confined to the poetical aspect of the song; the musical aspect is excluded. Our aim is to highlight the various salient linguistic features of this song through an in depth study at various levels: lexical, morpho-syntactic and semantic levels. From the available biographical data it is seen that the song owes it origin to a very trivial incident. Along with the linguistic study, we will try to demonstrate how far the circumstantial reality is reflected in the song.

Key words: Tagore's song, lexical feature, morpho-syntactic feature, semantic feature, biographical data.

এই নিবন্ধটি প্রেম পর্যায়ের একটি সুপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে (প্রেম / ১৩)। সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, এই গানের কাব্যরূপটিই আমাদের আলোচ্য। এই গানের কাব্য অবয়বের সৌন্দর্য আস্বাদনের উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন গঠক উপাদান বিশ্লেষণ করব। আমরা গানটি পাঠ করব বিভিন্ন স্তরে : শব্দচয়ন, বাক্য ও কলির বিন্যাস, শব্দসমূহের অবস্থান ও পারস্পরিক অন্বয়, বিভিন্ন ব্যাকরণগত উপাদানের ব্যবহার। একই সঙ্গে আমরা এই গানরচনা সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে গানটি পাঠ করে দেখব গানসৃষ্টির মুহূর্তের পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা গানের কথাবস্তুতে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে।

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে॥
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার-প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে॥
যখন শরৎ কাঁপে শিউলিফুলের হরষে
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।
গভীর রাতে কী সুর লাগায় আধো-ঘুমে আধো-জাগায়,
আমার স্বপন-মাঝে দেয় যে কী দোল দুলায়ে॥ [১]

এবার গানটি সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যটি দেখা যাক। গানটি রচনার উৎস নির্দেশ করেছেন শান্তিদেব ঘোষ।

১৩২৯ সালে কলকাতায় বিশ্বভারতীর তরফ থেকে 'বর্ষামঙ্গলে'র আয়োজন উপলক্ষে অনেক নতুন বর্ষার গান রচিত হয়েছিল।

আমরা সব গানের দল কলকাতায় কিছুদিন পূর্বেই জড়ো হয়েছি। খুব জোড় মহড়া চলেছিল, জোড়াসাঁকোর বাড়ি সরগরম হয়ে

উঠেছিল। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডায় গুরুদেবের গলা গেল বসে বর্ষামঙ্গলে তাঁর আবৃত্তি ইত্যাদি ছিল প্রধান আকর্ষণ,

ভাঙা গলা নিয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন --- নানাপ্রকার ওষুধ পাঁচন নিজে খাচ্ছেন, আমাদের খাওয়াচ্ছেন, গলা যাতে না

ভাঙে। সেই ভাঙা গলায় একটি গান রচনা করে দিনেন্দ্রনাথ ও আমাদের সকলকে ডেকে শিখিয়ে দিলেন সন্ধ্যায় গাইবার জন্য। গানটি হল 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে।' [২]

দেখা যাচ্ছে গানের কথাবস্তুর সঙ্গে গানরচনার পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ। গলা ভেঙে গেছে, গান গাওয়া যাচ্ছে না,ওষুধ খাওয়া হচ্ছে --- এমন পরিস্থিতিতে কোন লঘুরসের বা ঈষৎ হাস্যরসাত্মক গানের সৃষ্টি হওয়াটাই কি স্বাভাবিক ছিল না? কিন্তু এমন একটি নিতান্ত সাধারণ শারীরবৃত্তীয় ঘটনায় কবি যোগ করলেন এক ইন্দ্রিয়চেতনাতীত মাত্রা। গান গাওয়ার সাময়িক সেই অক্ষমতার অন্তরালে কবি প্রত্যক্ষ করলেন এক অদৃশ্য গানহরণকারীকে। সেই গোপনচারীর বিচিত্র লীলা গানের আস্থায়ী ও অন্তরা অংশে বিধৃত হয়েছে। গানের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ সঞ্চারী ও আভোগে সংযোজিত হয়েছে আর একটি আখ্যান --- এক মেঘমেদুর শ্রাবণদিনে হারানো গানকে শারদশোভার মাঝে ফিরে পাওয়ার আখ্যান। গানরচনার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে তার কোনই যোগসূত্র নেই --- এই আখ্যান একান্তভাবেই কবিকল্পনার নির্মাণ। একটি তুচ্ছ ঘটনাকে ভিত্তি করে এমনি করে একসূত্রে গ্রথিত হল গান হারানোর আর হারানো গান ফিরে পাওয়ার আখ্যায়িকা।

এই গানের পর্যায় প্রেম। কিন্তু বলাই বাহুল্য এই প্রেম নরনারীর চিরন্তন আকর্ষণ নয়। এই গান প্রেমাস্পদ পুরুষ বা প্রেমাস্পদা নারীর উদ্দেশে নয়, এই গান কোন মানবমানবীর বিরহমিলনের ভাষ্য নয়, নরনারীর সেই চিরকালীন সম্বন্ধ বিষয়ে কোন ভাবনা এই গানরচনার ভিত্তিভূমি নয়। এই প্রেমের প্রাণকেন্দ্রে বিরাজমান এক রহস্যময় গোপনচারী, এক অরূপ সত্তা ---- ইন্দ্রিয়চেতনার প্রান্তসীমায় তার আনাগোনা। বিভিন্ন পর্যায়ের গানে তার আভাস মেলে, আর সেই অরূপসুন্দরের সঙ্গে বিজড়িত থাকে গানের অনুষঙ্গ। পূজা পর্যায়ের ৫০ নং গানে দেখি কবির "হিয়ার মাঝে" সঙ্গোপনে যার অধিষ্ঠান, সেই অদেখা বন্ধুই তাঁর দুঃখ সুখের গানে সুরারোপ করে। প্রেম পর্যায়ের ৮নং গানে দেখা যায় কোন অলক্ষ্যচারীর লীলায় কবির হৃদয় গানের স্রোতে দীপের মত ভেসে চলে।[৩] আমাদের আলোচ্য গানের মত বিচিত্র পর্যায়ের ২২নং গানেও এক অন্তরালবর্তী হরণকারীর উপস্থিতি অনুভব করা যায় । সে অবশ্য গান হরণ করে না, হরণ করে স্বপ্নলোকের চাবি। কিন্তু কবি তাঁর গানের মধ্যেই তার অনুসন্ধান করে ফেরেন। অন্বিষ্ট সেই গোপনচারীর প্রাণের গভীর অতলে অবতরণ আমাদের আলোচ্য গানে মনের গহনে গানহরণকারীর বাসা বাঁধার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

খুঁজে যারে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর অতল-পানে
যে জন গেছে নাবি,
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি। [৪]

সেই অদেখার স্বরূপসন্ধানেই আমাদের আলোচ্য গানের সূচনা। গানের প্রথম কলি বা প্রথম বাক্যেই ক্রিয়ার কর্তা প্রশ্নবোধক সর্বনাম "কে"। তবে কে এই নেপথ্যচারী সেই প্রশ্নের উত্তর সমগ্র গানে কোথাও মেলে না। গানের

প্রথমার্ধে তাকে নির্দেশ করা হয়েছে শুধুমাত্র একটি সর্বনামে --- আস্থায়ীর ও অন্তরার শেষ কলিতে প্রায় সমান্তরাল অবস্থানে রয়েছে সর্বনাম "সে"। গানের দ্বিতীয়ার্ধে সঞ্চারী অংশে সাময়িক অনুপস্থিতির পর আভোগে আবার "তার" প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি। এই অংশের দুটি কলিতেই ক্রিয়ার অনুক্ত কর্তা এই "সে"। তবে "তার" কোন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না ; আমরা শুধু তার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করি।

গানের প্রথমার্ধে বিবৃত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে গভীর তাৎপর্যবাহী এক অন্তর্লীন ঐক্য ধরা পড়ে। "বাসা বাঁধা" " কুলায়" "পাখার ছায়া বুলানো" --- তার মধ্য দিয়ে আভাসিত হয় একটি পক্ষীরূপ। সেই গোপনচারী কবির মগ্নচেতনায় ধরা দিয়ে যায় বিহঙ্গরূপে। এই পক্ষীরূপকের এমন ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রেমের গানে দেখা যায়।

যে অধরা মাধুরীর সাধনায় তিনি সতত নিয়োজিত তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহী রূপ দিতে তিনি এই প্রতীকেরই আশ্রয় নিয়েছেন :

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।
ও যে সুদূর রাতের **পাখি**
গাহে সুদূর রাতের গান।।
বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে ওর রঙিন পাখা,
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা ॥[৫]

পরবর্তী গানটিতেও পাখি বাস্তবনিসর্গসংসারের অধিবাসী নয়, সে অতীন্দ্রিয়লোকবিহারী --- কবির নিভৃত সাধনার ধন। তাকে না পাওয়ায় বসন্তসৌন্দর্যের সব আয়োজন নিষ্ফল হয়ে যায় :

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই **পাখি**।
কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি॥
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে, পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো--
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি॥[৬]

কখনও এই পাখি কবির দ্বৈতসত্তার প্রতীক :

কে উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি
করুণ মধুর অধীর তানে বিরহবিধুর **পাখি** ॥[৭]

তবে পূর্বোক্ত গানগুলির মত আমাদের আলোচ্য গানে কোথাও "পাখি" শব্দটি অথবা অন্য কোন সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এই গানে সুস্পষ্ট ভাষায় নয়, আভাসে নির্মিত হয়েছে তার বাণীপ্রতিমা।

এই পাখির রূপকল্প নির্মাণের মূলে হয়তো বা বাউল গানের প্রভাব নিহিত রয়েছে। মনে আসে "গোরা" উপন্যাসের সূচনায় ব্যবহৃত সেই বাউল গানটি --- যে গান বিনয়ের মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করেছিল।

খাঁচার ভিতর অচিন **পাখি** কেমনে আসে যায়।[৮]

আমাদের আলোচ্য গানের অচিন পাখির আনাগোনা শুধুই খাঁচায় বা প্রাণপিঞ্জরে নয়, পাখির স্বাভাবিক পরিমণ্ডলে --- বনেও তার অবাধ বিহার। "বনমাঝে কি মনোমাঝে" সেই সংশয়ের অবকাশ থাকে না, মনে, বনে সর্বত্রই তার বিচরণ। প্রথমে তাকে দেখা যায় মনের গহনে নীড়রচনারত, পরক্ষণেই তার উপস্থিতি কুসুমবনে। যূথীগন্ধবিধুর বাদল বাতাস বহন করে আনে তারই পাখার ছায়ার স্পর্শ।

এই পরশের গুরত্ব অন্তরা অংশের মর্মবস্তু পাঠের মধ্য দিয়ে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। গানের অন্য তিন তুকেই রয়েছে গান বা সুরের কোন রূপকল্প। আস্থায়ীর শুরুতে রয়েছে কণ্ঠস্থিত গানের হারিয়ে যাওয়া, সঞ্চারীতে

গানের প্রত্যাবর্তন আর আভোগে শোনা যায় জাগরণে, নিদ্রায়, স্বপ্নে সেই ফিরে পাওয়া হারানো সুরের অনুরণন । কেবলমাত্র এই অন্তরা অংশেই গান বা তার অনুষঙ্গবাহী কোন শব্দ অনুপস্থিত। "সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা" ---- তাইতো গানের পরশহীন শূন্যতার মুহূর্তে পরম প্রাপ্তি সেই অচিন পাখির পাখার ছায়ার মৃদু পরশটুকু।

এই পরশের মাধ্যমরূপে যূথীর নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য। রবীন্দ্রভাবনাবিশ্বে যূথীর, বিশেষত যূথীর সৌরভের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ "পূরবী" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "চিঠি" কবিতাটি। বুয়ানোস এয়ারিসে থাকাকালীন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশে রচিত এই কবিতার সবটুকু জুড়ে আছে যূথী। সুদূর প্রবাসে অকস্মাৎ এক আবেশঘন মুহূর্তে সে এসে হানা দেয়।

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আঁতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই **জুঁই ফুটেছে** চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানি।[৯]

স্মৃতিমেদুর সেই সুরভি শুধু তাঁর সৌন্দর্যপিয়াসী চেতনাতেই মায়াজাল রচনা করে না, তাঁর বাস্তব নাগরিকচেতনাকেও উদ্দীপ্ত করে। তাই তো তিনি চরম সামাজিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে মেশিনগানের সামনে দাঁড়িয়েও যূথীর গানই গাইতে চান।

পালোয়ানের চেলারা সব যেদিন ওঠে খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসাদর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া
গর্জি বলে 'আমিই সত্য --- দেবতা মিথ্যা মায়া',
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান---
মেশিন-গানের সম্মুখে গাই **জুঁই ফুলের** এই গান।[১০]

কবিতার শেষে জুঁই এসেছে বিরহব্যথার অভিব্যক্তি [১১] হয়ে, মিলনসুখের অভিব্যক্তি[১২] হয়ে এবং সবশেষে অসীমের দীর্ঘশ্বাস হয়ে[১৩]। যূথীর সঙ্গে দীর্ঘশ্বাসের এই অনুষঙ্গ আমাদের আলোচ্য গানের শব্দবন্ধটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় : যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে।

অন্যান্য একাধিক গানে যূথীর নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। যূথীর দেখা মেলে শ্রাবণসন্ধ্যায় ব্যাকুল প্রতীক্ষার নিভৃত ক্ষণে। অন্য সকলের মত কবি এই প্রতীক্ষার অবসান খোঁজেন না, তিনি চান এই প্রতীক্ষায় বিস্ময়মাধুর্য সঞ্চার করতে। সেই ভূমিকা পালন করে যূথীমালার মৃদু সুবাস :

আনো বিস্ময় মম নিভৃত প্রতীক্ষায় **যূথীমালিকার মৃদু গন্ধে** [১৪]

আবার যূথীর তীব্র সুবাস-ভারাক্রান্ত অশান্ত বাতাস হয়ে ওঠে নিদারুন বিচ্ছেদশঙ্কাতুর হৃদয়ের উপমা :

যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে।[১৫]

এই সিক্ত যূথীর সৌরভে লীন বিদায়ক্ষণের না বলা বাণীটি

বারেক তোমায় শুধাবারে চাই বিদায়কালে কী বল নাই,
সে কি রয়ে গেল গো **সিক্ত যূথীর গন্ধবেদনে**॥[১৬]

সিক্ত যূথীমালার সৌরভ আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে ; সেই গভীরতা পূজার উপকরণের দীনতাকে ছাপিয়ে যায়।

পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি **সিক্ত যূথীর মালা**
সকরুণ-নিবেদনের- গন্ধ-ঢালা---
লজ্জা দিয়ো না তারে ।[১৭]

গানে শুধুমাত্র যূথীর সজল রূপটুকুই আমরা দেখি না, গ্রীষ্মের নীরস শুষ্কতার মধ্যে, তপ্ত হাওয়ার পটভূমিতেও দেখা তার দেখা মেলে। রবীন্দ্রনাথের গ্রীষ্মের গানে ফুলের রূপকল্পের ব্যবহার নিতান্ত বিরল ; নির্দিষ্ট কোন ফুলের নাম এসেছে মাত্র দুটি গানে। ষোলটি গানের মধ্যে একটি গানে (প্রকৃতি / ১৯) আছে বকুল ও চাঁপা, আর একটি গানে (প্রকৃতি / ২৩) বনযূথী ও চাঁপা। শুধুমাত্র গ্রীষ্মের পটভূমিতে যূথীর এই বিরল উপস্থিতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; তার ভূমিকাও অনন্য। প্রেমের স্মৃতিচারণ রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানে রয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কৈশোরের প্রেমের স্মৃতিচারণ শুধু এই একটি গানেই। ফেলে আসা দিনের সেই স্মৃতি উদ্দীপ্ত করে বনযূথীর সুবাস।

কৈশোরে যে সলাজ কানাকানি খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায় মর্মরিছে গহন বনে বনে॥
যে নৈরাশা গভীর অশ্রুজলে ডুবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সেই **বনযূথীর বাসে** উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে,
সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায় গুঞ্জরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥ [১৮]

তবে শুধুমাত্র স্বপ্নময় ভাবাবেশ রচনাই নয়, যূথীসুবাস উদ্দাম প্রাণতরঙ্গও জাগিয়ে তুলতে পারে। চিত্রাঙ্গদার আত্ম-উদ্দীপনার গানে তাই তার উপস্থিতি। প্রবল ঝড় সমস্ত জীর্ণ, পুরাতনকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পর বনযূথীর সুবাস উচ্ছ্বসিত হয়ে অজানার দিকে ধাবিত হয়।

যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে--
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে॥[১৯]

এমন যার মোহিনীশক্তি, এমন বৈচিত্র্যময় যার ভূমিকা সেই যূথীই গীতহীন শূন্যতার মধ্যে অমৃতস্পর্শ নিয়ে আসতে পারে।

সমগ্র গানের মধ্যে এই অন্তরা অংশের একটি স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় শব্দচয়নের স্তরে। গানের অন্য তিনটি তুকেই দ্বিতীয় কলিতে বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় 'যে'র উপস্থিতি। গানহরণের পরই গানহারীর মনের গভীরে বাসা বাধা, হারানো গানের প্রত্যাবর্তন, এবং জাগরণে, নিদ্রায়, স্বপ্নে সেই সুরের বিস্তার --- ওই তিন তুকে বিবৃত ঘটনাগুলি যেন প্রত্যাশিত সাধারণ ঘটনা নয়। কোন না কোন ভাবে তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, খানিক হলেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অব্যয় 'যে'র প্রয়োগ তারই সঙ্কেত দেয়। অপরপক্ষে সম্পূর্ণভাবে গানের অনুষঙ্গবর্জিত এই অন্তরা অংশে এই অব্যয়টি অনুপস্থিত কেননা গানহারা এই পর্বে বিস্ময়ের লেশমাত্র নেই, আছে শুধুই হারানো গানের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা।

সেই প্রতীক্ষার বাণীরূপায়ণ এই গানে ঘটে নি। তবে এই অন্তরা অংশের বাক্যগঠনরীতিটি এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। বাক্যগঠনের পর্যায়ে গানের বাকি তিন অংশের থেকে এই তুকটির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। এই অংশে একটিমাত্র বাক্য দুটি কলিতে বিস্তৃত। আস্থায়ী ও আভোগ উভয় অংশেই প্রতিটি কলিই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। অন্তরার মত

সঞ্চারী একটিমাত্র বাক্যে গঠিত হলেও দুটি কলির প্রত্যেকটিতেই একটি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য রয়েছে। কালবাচক সংযোজক পদ "যখন"এর দ্বারা বাক্যদুটিকে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অন্তরায় একটিমাত্র সরল বাক্য দুটি কলি জুড়ে। একক বাক্যের এই আয়তন পরিসরের ব্যাপ্তির অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং সেই অনুভূতি গানের মধ্যে এই অংশে গভীরতম । বাক্যের আয়তনের এই বিস্তৃতিকে প্রতীক্ষার দৈর্ঘ্যের প্রতিফলনরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সঞ্চারীতে পর্বান্তর ঘটে। অন্তরায় গানহারা শূন্যতার পর সঞ্চারীতে হারানো গানের বহুপ্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তন।এই ক্ষেত্রে দুই তুকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিসাম্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হারিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসার সামগ্রিক বিবর্তন প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করতে হলে এই দুই তুকের তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে।

দুটি তুকেই প্রথম কলির প্রথমার্ধে উপস্থাপিত কালগত পটভূমি --- যথাক্রমে বর্ষা ও শরৎ। দ্বিতীয়ার্ধে রয়েছে ফুলের রূপকল্প। অন্তরাতে যূথী, সঞ্চারীতে শিউলি। বলা চলে প্রথমার্ধে কালগত পটভূমি নির্মাণের পর, দ্বিতীয়ার্ধে স্থানগত পটভূমি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে যূথীবন স্পষ্টতই সেই পটভূমি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে "শিউলিবন" শব্দটি ব্যবহার করা না হলেও তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। যূথীবনের সমান্তরালে শিউলিবন। তবে কোনক্ষেত্রেই শুধুমাত্র স্থানগত পটভূমি উপস্থাপন করা হয় নি। দুটিক্ষেত্রেই আমরা দেখি পুষ্পদ্যোতক শব্দদুটির সম্বন্ধপদের রূপ। উভয়ক্ষেত্রেই ফুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হৃদয়ানুভূতি - প্রথমক্ষেত্রে বেদনা (বেদনার অনুষঙ্গবাহী দীর্ঘশ্বাস), দ্বিতীয়ক্ষেত্রে হর্ষ।

একই প্রতিসাম্য দেখা যায় দুই তুকের দ্বিতীয় কলিতেও। অন্তরা ও সঞ্চারীর দ্বিতীয় কলির দ্বিতীয়ার্ধে আছে স্পর্শ। সঞ্চারীর দ্বিতীয়ার্ধে স্পষ্টতই রয়েছে "গানের" পরশ। অন্তরাতে "পরশ" শব্দটি না থাকলেও "বুলিয়ে দেওয়া" ক্রিয়াটি স্পর্শদ্যোতক। গানের পরশের সমান্তরাল অবস্থানে আছে গানহারীর পাখার ছায়ার পরশ। দুটি ক্ষেত্রেই প্রথমার্ধে রয়েছে একটি আধার --- প্রাণ, নয়ন। গানহরণকারীর পরশ আসে প্রাণে, ফিরে আসা গানের পরশ নয়নে। সমগ্র বিষয়টি চিত্রাকারে এই ভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

	প্রথম কলি			দ্বিতীয় কলি	
	প্রথমার্ধ	দ্বিতীয়ার্ধ		প্রথমার্ধ	দ্বিতীয়ার্ধ
	কালগত পটভূমি	ফুল	হৃদয়ানুভূতি	আধার	পরশ
অন্তরা	বর্ষা	যূথী	বেদনা	প্রাণ	গানহরণকারীর পাখার ছায়া
সঞ্চারী	শরৎ	শিউলি	হর্ষ	নয়ন	গানের

এবার আমরা প্রতিসম অবস্থানে স্থিত বিভিন্ন গঠক উপাদানের বৈপরীত্য বা স্বাতন্ত্র্যের উপর আলোকপাত করব। অন্তরার পর সঞ্চারীর শুরুতেই কালগত পটভূমির পরিবর্তন। ঋতুনাট্যের রঙ্গমঞ্চে বর্ষার পর শরতের আবির্ভাব। কিন্তু পটভূমির নির্মাণকৌশল ভিন্ন। অন্তরার প্রথম কলির প্রথমার্ধে উপস্থাপিত বর্ষার পরিসরটি বিস্তৃততর । প্রথমে "মেঘের দিন" তারপর আবার সুনির্দিষ্ট ভাবে মাসের উল্লেখ, "শ্রাবণ মাস"। যেহেতু কালগত পটভূমি তাই প্রত্যাশিতভাবেই শব্দগুচ্ছ দুটির অধিকরণ কারকের রূপটি ব্যবহৃত "দিনে" "মাসে" । সম্পৃক্ত ক্রিয়াপদটি পরের কলিতে—"দেয় বুলায়ে"। অন্যদিকে সঞ্চারীর প্রথম কলির প্রথমার্ধে শরতের উপস্থাপনায় শুধুমাত্র "শরৎ" নামটুকু ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ষার মেঘমেদুর দিনের বিপরীতে শরৎ আলোর উদ্ভাস আসে নি, শরতের নৈসর্গিক পরিমণ্ডলের লেশমাত্র প্রতিফলন এই অংশে ঘটে নি। আর্থস্তরে বর্ষার মত কালগত পটভূমি হলেও, ব্যাকরণগত পর্যায়ে

"শরৎ" এখানে ক্রিয়ার কর্তা (ক্রিয়াপদ "কাঁপে")। এই পার্থক্যের কারণ কলিদুটির শেষে পাওয়া যাবে। আমরা দেখেছি দুই কলির শেষে সমান্তরালভাবে অভিব্যক্ত দুই বিপরীত অনুভূতি --- বেদনা (দীর্ঘশ্বাস) এবং হর্ষ। গভীরতর পাঠে দেখা যাবে গান হারানোর বেদনার চেয়ে বহুগুণ তীব্র গান ফিরে পাওয়ার আনন্দ। বর্ষার ছায়াঘন দিনে গানহারা হৃদয়ের বেদনাতুর অনুভূতি যূথীসুবাস ভারাক্রান্ত বাতাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই গান ফিরে আসার মুহূর্তে কবিহৃদয়ে উৎসারিত হর্ষের অভিব্যক্তি শুধুই শেফালিবনে বাতাসের আন্দোলনে নয়। সেই আনন্দহিল্লোল সঞ্চারিত হয় সমগ্র নিসর্গলোকে। আমরা দেখি ফুলবনের নয়, শরৎঋতুর শিহরণ । শরৎ তখন আর বর্ষার মত কোন কালগত পটভূমি নয়, শরৎ হয়ে ওঠে গানের প্রত্যাবর্তনের এই অধ্যায়ের একটি চরিত্র ---যে হারানো গানের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রত, সেই ভাবনায় রোমাঞ্চিত।

অবশেষে কণ্ঠ থেকে ছলনায় হরণ করা "সেই গান" ফিরে আসে গোপনে --- কিন্তু কণ্ঠে নয়। এমনকি শ্রবণেও নয়। প্রত্যাবর্তনের অভিমুখ গভীর বিস্ময় জাগায়। গানের প্রত্যাবর্তন ঘটে "নয়নে"। গান ---- শ্রুতিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকল্প --- রূপান্তরিত হয় দৃশ্যকল্পে। যে কবি গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে "দেখেন" তাঁর নান্দনিক চেতনায় দৃষ্টি আর শ্রুতির মধ্যবর্তী সব ব্যবধান ঘুচে যায়।

ইন্দ্রিয়চেতনার এমন রূপান্তর আমরা রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানে দেখি। নববর্ষা সমাগমে সকরুণ রাগিণী বেজে ওঠে প্রতীক্ষমাণা বিরহিণীর হৃদয়ে নয়, নয়নে।

এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
(...)
নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী॥ [২০]

রবীন্দ্রনাথের গানে দুটি বাদ্যযন্ত্রের সর্বাধিক উপস্থিতি : বাঁশি ও বীণা। দুটিরই ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়েছে "নয়নে"। নয়নে বংশীধ্বনির দৃষ্টান্ত :

আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে,
(...)
আমার লতার প্রথম মুকুল প্রভাত-আলোক-মাঝে
শুধায় আমারে 'এসেছি এ কোন্ কাজে'।
টুটিতে গ্রন্থি কাজের জটিল বন্ধে,
বিবশ চিত্ত ভরিতে অলস গন্ধে,
বাজাতে বাঁশরি প্রেমাতুর দুনয়ানে ॥ [২১]

মুগ্ধনয়নে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর বীণাধ্বনিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত :

এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
(...)
সামনে চেয়ে এই **যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়**॥ [২২]

নিসর্গলোকের ভাষাহারা, অশ্রুত সঙ্গীত ধ্বনিত হয় দূরপথের পথিকের নয়নে :

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার মোর করুণ রঙিন পথ!
এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে, মোর দুয়ারে লেগেছে রথ ॥

সে যে সাগরপারের বাণী মোর পরানে দিয়েছে আনি, আহা
তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্যপর্বত ॥ [২৩]

বৃষ্টিধারার সুর মায়াজাল বিস্তার করে দুচোখে :

ওই-যে ঝড়ের মেঘের কোলে
(...)
আমার **দুই আঁখি ওই সুরে**
যায় হারিয়ে সজল ধারায় ওই ছায়াময় দূরে।[২৪]

বর্ষাসমাগমে উদ্গাত নবতৃণদলের নীরব আহ্বান এসে পৌঁছয় স্বপ্নাবেশবিভোর কবিপ্রাণে। কিন্তু ইন্দ্রিয়চেতনাতীত সেই বাণীকে কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহী রূপ দেন। সেই আহ্বানের মাধ্যম হয় "গভীর স্বর" আর তার লক্ষ্যস্থল কবির "আঁখি":

তাই এমন **গভীর স্বরে**
আমার **আঁখি** নিল ডাকি ওদের খেলাঘরে—[২৫]

ধ্বনির দৃশ্যে রূপান্তরের একাধিক দৃষ্টান্ত আমরা দেখলাম। কিন্তু লক্ষণীয় আমাদের আলোচ্য গানে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে ধ্বনি নয়, ধ্বনির স্পর্শ। নয়নে প্রত্যাবর্তন ঘটছে "গানের" নয়, "গানের পরশের"। আস্থায়ীতে হারিয়ে যাওয়া গান আর অন্তরাতে গানহারা মুহূর্তে গানহারীর পরশ পরবর্তী সঞ্চারীতে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় --- তখন অনুভব করা যায় "গানের পরশ"।

ধ্বনির বা আরও নির্দিষ্টভাবে গানের সঙ্গে স্পর্শের একাত্মতার এমন দৃষ্টান্ত আমরা পাই আরও দুটি গানে। "গানের পরশ" শব্দবন্ধটি পূজা পর্যায়ের ৬০৩ নং গানেও ব্যবহৃত হয়েছে।

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে ----
গানের পরশ প্রাণে এল, আপনি তুমি রইলে দূরে।। [২৬]

অবিকল একই শব্দবন্ধ ব্যবহৃত না হলেও সেই ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে পূজা পর্যায়ের ১৭ নং গানেও :

আমার যে **গান** তোমার **পরশ** পাবে [২৭]

পূর্বোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়চেতনার এই রূপান্তর একমাত্রিক --- ধ্বনির রূপান্তর ঘটছে দৃশ্যে অথবা পরশে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে এই রূপান্তর দ্বিমাত্রিক। ধ্বনি স্পর্শের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে --- হারানো গান স্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে দর্শনন্দ্রিয়ে ধরা দিচ্ছে।

ইন্দ্রিয়চেতনাজগৎ থেকে হারিয়ে যাওয়া গানের পুনরাগমন ঘটে ইন্দ্রিয়চেতনাজগতের আভ্যন্তরীন সমস্ত স্তরবিন্যাস বিপর্যস্ত করে। দৃশ্য, ধ্বনি ও স্পর্শের মধ্যবর্তী সব সীমারেখা অবলুপ্ত হয়ে যায়।

এই গানের মধ্যে সঞ্চারী অংশের স্বাতন্ত্র্যের আর একটি দিক ধরা পড়ে সর্বনামের প্রয়োগে। অন্য তিনটি তুকেই সর্বনামের প্রথম ও উত্তম পুরুষের রূপের ব্যবহার গানহারী ও কবির সুস্পষ্ট উপস্থিতি নির্দেশ করে। আমরা আগেই আস্থায়ী ও অন্তরায় প্রথম পুরুষের প্রায় প্রতিসম অবস্থানের উল্লেখ করেছি : "সে"। আভোগ অংশে দুটি কলিতেই বাক্যের কর্তা উহ্য থাকলেও একথা স্পষ্ট যে এই দুটি ক্ষেত্রেও অনুক্ত কর্তা হল "সে" । সর্বনামের ব্যবহার না হলেও ক্রিয়ারূপের মধ্য দিয়ে (লাগায়, দেয়... দোল) "তার" বা সেই গানহরণকারীর প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করা যায়। অন্যদিকে এই তিন তুকেই উত্তমপুরুষের সম্বন্ধপদটি ব্যবহৃত হয়েছে : "আমার"। কবির কোথাও কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই, তিনি ক্রিয়াসম্পাদনকারী নন, প্রতিটি ক্ষেত্রে কবির সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন আধারের ভূমিকাই মুখ্য :

আস্থায়ীতে "আমার কণ্ঠ", অন্তরায় "আমার প্রাণ", আভোগে "আমার স্বপন"। শুধুমাত্র এই সঞ্চারী অংশেই সর্বনামের উত্তম ও প্রথমপুরুষের রূপ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। সেই গানহারীই আবার গান ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু তার সেই গানপ্রত্যর্পণকারীর ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায় না। দ্বিতীয় কলিতে কর্মকর্তৃবাচ্যের প্রয়োগে ক্রিয়াসম্পাদনকারী অন্তরালে চলে যায়। গানহরণকারীর ছলনায় গান হারিয়ে যায় "আমার কণ্ঠ" থেকে কিন্তু তার পুনরাগমন ঘটে "আমার নয়নে" নয়, "নয়নে"। হারিয়ে যাওয়া গান ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র পরিসর অতিক্রম করে বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হয়। গানের এই অংশে কবি ও গানহরণকারী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, সত্য শুধু গানের প্রত্যাবর্তন, গানের প্রত্যাবর্তনে সঞ্চারিত হৃদয়ের অনুভব --- তারই বহিঃপ্রকাশ শরৎঋতুর শিহরণে, মুগ্ধ নয়নের ভাবাবেশবিহ্বলতায়।

হারানো গানের প্রত্যাবর্তনমুহূর্ত থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পর্যালোচনায় একটা রূপরেখা ধরা পড়ে। গানের পুনরাগমন "নয়নে" ; তারপর সেই ফিরে পাওয়া সুর বাজে "আধো-ঘুমে আধো-জাগায়" ; অবশেষে সে সুর দোলা দেয় "স্বপন মাঝে"। এইভাবে জাগ্রত নেত্র থেকে, জাগরণ-নিদ্রার মধ্যবর্তী ধূসর অঞ্চল অতিক্রম করে নিদ্রার পরপারে স্বপ্নলোক পর্যন্ত গানের যাত্রাপথের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়।

গানের বাকি অংশের সঙ্গে এই আভোগ অংশের একটি পার্থক্য শব্দের প্রয়োগসংখ্যায়। এই একটি মাত্র তুকেই শব্দের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এই তুকের দুটি কলিতেই ব্যবহৃত হয়েছে প্রশ্নবোধক শব্দ "কী" (কী সুর, কী দোল)। আস্থায়ীতে প্রশ্নবোধক শব্দ "কে" ব্যবহৃত হলেও তা শুধুমাত্র একবার মাত্র একটি কলিতে প্রযুক্ত হয়েছে। গানের শুরুতে গানহারীর স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস পরবর্তী অংশে আর কোথাও দেখা যায় না। গানের শেষে গভীরতর প্রশ্নব্যাকুলতা শুধু ফিরে আসা গানকে ঘিরে। গভীর রাতে জাগরণ-নিদ্রার মাঝামাঝি যে সুর বাজে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না ; সেই সুরে স্বপ্নের গভীরে যে দোলা লাগে তাও ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আভোগে প্রশ্নবোধক "কী" শব্দের পুনরাবৃত্তি সেই গভীর প্রকাশবিহ্বলতার অভিব্যক্তি।

এই আভোগ অংশের আর একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র আমরা আগেই উল্লেখ করেছি --- অনুক্ত কর্তার প্রয়োগ। গানের বাকি তিন অংশে প্রতিটি বাক্যেই ক্রিয়ার কর্তার সুস্পষ্ট উপস্থিতি। শুধুমাত্র আভোগে দুটি বাক্যেই ক্রিয়ার কর্তা উহ্য। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে দুটি ক্ষেত্রেই অনুক্ত কর্তা হল আস্থায়ী ও অন্তরার "সে" অর্থাৎ গানহরণকারী। গানহরণকারী গভীর রাতে আধো ঘুমে আধো জাগরণে অজানা সুর বাজায় আবার সেই স্বপ্নের মধ্যে দোলা দেয়। প্রাথমিক পাঠের ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় কলি বা দ্বিতীয় বাক্যের একটি ভিন্নতর পাঠও সম্ভব। এই বাক্যের ক্রিয়ার অনুক্ত কর্তা যেমন "সে" হতে পারে তেমনি "সুর"ও হতে পারে। অর্থাৎ গানহরণকারী সুর বাজায়, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে দোলা দেয় "সে" নয়, তার বাজানো "সুর"। এই ব্যাখ্যাও সমান গ্রহণযোগ্য। স্বপ্নের মধ্যে এই দোলা কে দেয়--- গানহরণকারী না তার দেওয়া সুর ---এই অস্পষ্টতা যেন দুইয়ের অভিন্নতার সঙ্কেত দেয়। যে গান হরণ করে সে সেই গানকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে সেই গানের সঙ্গেই যেন একাত্ম হয়ে যায়।

এই গানের মর্মবস্তু এবং সেইসঙ্গে গানরচনার পটভূমিতে নিহিত কাহিনি প্রেম পর্যায়ের আর একটি গানকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।।
চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা, পুন বুঝি দিল দেখা---
বনে বনে তব লেখনীলীলার রেখা,
নবকিশলয়ে গো কোন্ ভুলে এল ভুলি তোমার পুরানো আখরগুলি।।
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।

কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী মনে দিল আজি আনি
বিরহের কোন্ ব্যথাভরা লিপিখানি।
মাধবীশাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি তোমার পুরানো আখরগুলি।[২৮]

গানটি রচনার উপলক্ষটি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথের জবানিতে বিবৃত করেছেন প্রশান্ত পাল।

চাতালে বসে দেখলুম গ্রীষ্মের শুকনো হাওয়া লাল কাঁকরের রাস্তার উপর ফরফর করে একটা ছেঁড়া চিঠির টুকরো

উড়ে চলেছে ; ব্যাস ঐটুকু। কেমন যেন মনের মধ্যে একটি ছবি তৈরী হয় উঠলো যে একদিন যে চিঠির কতো

আদর ছিল আজ তা অনাদরে পথের ধূলোর উপর উড়ে চলে যাচ্ছে। এই ছবিটাতে মন উদাস হোলো বলেই সঙ্গে

সঙ্গে গান আপনি তৈরী হয়ে উঠেছে। [২৯]

দুটি গানেরই পটভূমিতে নিহিত আছে অতি তুচ্ছ ঘটনা। আর দুটি গান একই ভাববস্তুর উপর নির্মিত --- ইন্দ্রিয়চেতনালোক থেকে হারিয়ে যাওয়া এবং অবশেষে আবার হারাধন ফিরে পাওয়া। আমাদের আলোচ্য গানে আমরা দেখেছি শারদশোভার পটভূমিতে এক শ্রাবণদিনে হারিয়ে যাওয়া গানের মহিমাময় প্রত্যাবর্তন। সমান্তরলভাবে শেষোক্ত গানে দেখি কোন নামহীন অতীতে লিখিত পত্রের হারিয়ে যাওয়া "পুরানো আখরগুলি" আবার ফিরে আসে চৈত্ররজনীতে। ধূলিধূসরিত অপাঠ্য সেই লিখন ছিন্নপত্রের পরিসর অতিক্রম করে নিসর্গশোভায় পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় --- তারা দেখা দেয় বনে বনান্তরে--- মল্লিকাবনের সুরভিবিস্তারে --- মন্দ পবনে আন্দোলিত মাধবীশাখার শিহরণে।

দুটি গানে একই বার্তা ঘোষিত --- রবীন্দ্রচেতনাবিশ্বে কোন কিছুই হারায় না। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলা চলে :

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে। [৩০]

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ২৭৫-২৭৬
২) ঘোষ, শান্তিদেব : রবীন্দ্রসঙ্গীত, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৮, পৃ ১৯৮ - ১৯৯
৩) ওরে আমার হৃদয় আমার , কখন তোরে প্রভাতকালে
দীপের মতো গানের স্রোতের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে।
(ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ২৭৩)
৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৫৫৩
৫) তদেব পৃ ৩৬৩
৬) তদেব, পৃ ৩৭৪
৭) তদেব, পৃ ৩৯০
৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গোরা, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, ১৯৯৫, পৃ ৩৭৯
৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, ১৯৯৫, পৃ ১৮৬

১০) তদেব, পৃ ১৮৮
১১) বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই
ও আমার জুঁই !
(তদেব, পৃ ১৮৯)
১২) মিলনসুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই
ও আমার জুঁই !
(তদেব, পৃ ১৮৯)
১৩) অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই
ও আমার জুঁই !
(তদেব, পৃ ১৮৯)
১৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৭৬
১৫) তদেব, পৃ ৩৪৯
১৬) তদেব, পৃ ৩৮২
১৭) তদেব, পৃ ৪৭১
১৮) তদেব, পৃ ৪৩৬
১৯) তদেব, পৃ ৬৮৬
২০) তদেব, পৃ ৪৩৭
২১) তদেব, পৃ ৩২৩-৩২৪
২২) তদেব, পৃ ৫৪৯-৫৫০
২৩) তদেব, পৃ ২২৮
২৪) তদেব, পৃ ৪৫২-৪৫৩
২৫) তদেব, পৃ ৪৫৩
২৬) তদেব, পৃ ২৩৭
২৭) তদেব, পৃ ১৭
২৮) তদেব, পৃ ৩৮২ - ৩৮৩
২৯) পাল, প্রশান্তকুমার : রবীন্দ্রজীবনী, নবম খণ্ড, কলকাতা,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩, পৃ ২৯৫
৩০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ২৩৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩
দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
বিশ্বাস, অপূর্ব : ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬
রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৮০
সরকার, পবিত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্তি ,গানের ঝরনাতলায়, কলকাতা,প্রতিভাস , ২০১৩
সর্বাধিকারী, কেতকী : রবির আলোয় ঋতুদের শোভাযাত্রা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৪
সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২